সহজিয়া সাতকাহন

জয়ন্ত মিস্ত্রী

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, স্নাতোকত্তোর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেজ

‘সহজমতে এবং সহজস্বরূপকে লাভ করবার জন্য যারা সাধনা করে (বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণবসহজিয়া)’’১ — তাঁরাই সহজিয়া। ‘‘ইঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণজগৎপতি, সুতরাং তিনিই কেবল সকলের একমাত্র পতি। যিনি গুরু তিনিই শ্রীকৃষ্ণএবং শিষ্যরা শ্রীমতী রাধিকা স্বরূপ। নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় এই পঞ্চবিধ আশ্রয় ভজন প্রণালীর অন্তর্গত। সহজীদিগের মতানুসারে শেষ দুইটি সর্ব্বপ্রধান। ঐ রস নায়ক-নায়িকার সম্ভোগস্বরূপ। উহা দুই প্রকার; স্বকীয় ও পরকীয়। সহজসাধনে পরকীয় রসই শ্রেষ্ঠ। গুরু শিষ্যা উভয়ে দুই আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া ও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকা জ্ঞান করিয়া রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ রাসলীলা করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। ইহাকেই সহজসাধন কহে।’’২

সহজিয়া সাধকগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত কেননা, ‘‘সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনাতেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ন্যায় মানব মহিমা স্বীকৃত; কিন্তু ব্যাপকতর, গভীরতর অর্থে। এখানে মানুষই সবকিছু—‘সবার উপরে মানুষ সত্য’। মানুষের ভিতরেই ঈশ্বরলীলা। এখানে পুরুষ নিজের উপর কৃষ্ণভাব এবং নারী নিজের উপর রাধাভাব আরোপ করে।

এই আরোপের অবস্থায় নরনারীর ‘শ্রীরূপলীলা’। নর-নারী কৃষ্ণ-রাধা হইবার সাধনায় কৃষ্ণরাধা সাজিয়াছে। এই অবস্থায় নরনারীর যে মিলনানন্দ তাহা গুপ্তচন্দ্রপুরস্থিত রাধাকৃষ্ণলীলার রসপুষ্ট। এই ‘আরোপ-সাধনা’ যদি চিরকাল আরোপেই সীমাবদ্ধ থাকিত তবে নরনারীর জীবনমহিমা চূড়ান্ত স্বীকৃতি পাইত না। ঐ আরোপ-সাধনার একটি সিঁড়ির অবস্থা আছে, যখন নরনারী আর ভাবারোপে কৃষ্ণ-রাধা নয়, সত্যই কৃষ্ণ ও রাধা হইয়া যায় — তখন ‘চরম সুখাবস্থা’, ‘সমরস সহজ’ অবস্থা। তখন ‘শ্রীরূপলীলা’র পরিণতি ‘স্বরূপলীলা’য়, ‘স্বরূপলীলা’ রাধা কৃষ্ণেরই একান্ত।’’৩

বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) সহজিয়া সা সাধনার মূল উপজীব্য ‘পিরীতিতত্ত্বে’র বর্ণনা।

(খ) কিশোরী ভজনা।

(গ) নরনারীর মধ্যে রাধা কৃষ্ণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার অবস্থায় উভয়ের মিলনে সৃষ্ট হয় ‘পূর্ণসামরস্যজনিত অসীম অনন্ত আনন্দানুভূতি’। সহজিয়া বৈষ্ণবের নিকতে এই অবস্থার নাম ‘প্রেম’। তন্ত্র একে বলে ‘সামরস্য সুখ’; বৌদ্ধ বলে ‘মহাসুখ’; অন্য বৈষ্ণব বলে ‘মহাভাবস্বরূপ’। সহজিয়া বৈষ্ণবের নিকত এই ‘প্রেম’—এরই প্রতিশব্দ ‘পিরীতি’।

(ঘ) এখানে কিশোরী অন্য কেউ নন—স্বয়ং রাধিকা।

(ঙ) সাধারণ বৈষ্ণব রাধাকে বয়সের হিসেবে কিশোরী বলে, এঁর সঙ্গে ভজন শব্দতি যুক্ত আর সহজিয়াগণ রাধা-কিশোরীর ভাবারোপে নিজ কিশোরীর সেবা করে থাকে।

এখন আমরা সহজিয়া সাধকদের কথা ‘‘গগন বৈরাগ্য’ কিম্বা ‘সুকান্ত মজুমদার’-এর সাক্ষাৎকারে জেনে নিতে পারি। প্রৌঢ় গগন বৈরাগ্য আর তাঁর বৃদ্ধ জটাজুটধারী গুরু পাশাপাশি বসে আছেন পদ্মাসন করে। নিমীলিত। মুখ প্রশস্ত। গাহক গাইছে গুরুতত্ত্ব ঃ

‘‘গুড়ের মতন যে দেখছি গুরুধন।
ভিয়ান না করিলে গুড়ে সন্দেশ হয় না মন।।
যেমন গুড় ভিয়ান করে
তেমনই গুরু সেবার তরে
ময়রা হয়ে থাকে পড়ে
সেই তো রসিক জন।।
সেবায় রাজ ভিয়ানে খাজ
যে করে সেই মারে মজ
করতে নারলে থাকে প্রজ
বুদ্ধুর মতন।।’’৪ক

‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ’—এ এককালে ছিলেন সন্ন্যাসী এখন গৃহী এমন একজন হলেন সুকান্ত মজুমদার। মঠে মন্দিরে অন্তত পনেরো বছর কাটিয়েছেন, শাস্ত্র পড়িয়েছেন, নিয়েছেন গৈরিক বাস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছেড়ে এসেছেন সেই পথ। তবে

আচরণ তো রক্তে মেশা। বৈষ্ণব বিনয় ও নিরভিমান স্বভাব সুকান্তবাবুর মজ্জাগত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যাই তাঁর কাছে খতকা ঘোচাতে। সেদিন কথায় কথায় এমনই এক জিজ্ঞাসায় তাঁকে বললাম ঃ "বাংলার সহজিয়াবাদের উৎস ও প্রসার সম্বন্ধে কিছু বলুন। গোঁড়া বৈষ্ণবদের প্রতিক্রিয়াতেই তার ব্যাপকতা?"

প্রথমে 'আমি কি জানি বলুন' 'কততুকু বা পড়াশুনা করেছি' এইসব গৌরচন্দ্রিকা করে সুকান্তবাবু বললেন ঃ

"আসলে সহজিয়াদের সূচনা মহাপ্রভুরও আগে চণ্ডীদাসের পদে পাবেন অনেক ইঙ্গিত। গৌড়বঙ্গে কৃষ্ণধামালীর একতা লৌকিক গল্প চালু ছিল; কৃষ্ণ, রাধা, আয়ান ঘোষ আর বড়াই বুড়িকে নিয়ে 'অবৈধ প্রেমের দেহকেন্দ্রিক গল্প'। জানেন তো 'ভাগবত'-এ রাধার নাম কোথাও নেই। জয়দেব লৌকিক কাঠামো থেকেই রাধাকে তৈরী করেন। বড়ু চণ্ডীদাস সেই কৃষ্ণ রাধার গল্পে কামনা, আকুলতা, ছলনা আর বিরহ বুনে তাকে জনপ্রিয় করে দেন। সহজিয়ারা এই গল্প ও গান খুব পছন্দ করত। এরপরে বৌদ্ধ সহজিয়া, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে কিছু এসে যায়। এসব ছিল খুব গোপন।"৪খ

"ঃ কিন্তু সহজিয়ারা কি তখন ধর্মসম্প্রদায় ছিল এখনকার মত?

ঃ মনে হয় না। ওতা ছিল গোপন আচরণ, সমাজের খুব অন্ত্যজবর্গে। কিন্তু মহাপ্রভুর পরে যারা সহজিয়া বলে ফুতে বেরোলো তারা কিন্তু বেশ সংগঠিত ও সচেতন। আসলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের গোঁড়ামি বৃন্দাবনের সংস্কৃতি অনেক শূদ্রের পক্ষে সহ্য হয়নি। তারা প্রতিবাদ খুঁজছিলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের 'গৌরনাগর সাধনা', নবদ্বীনের 'মঞ্জরী সাধনা' আর পরকীয়াবাদের অন্য ব্যাখ্যা থেকে সহজিয়া বৈষ্ণবরা জেগে ওঠে। শ্রীচৈতন্যের গুহ্যসাধনাকে সামনে রেখে দেহ-কড়চা নামে অজস্র পুঁথি লেখা হয়। সে সবই শূদ্রের লেখা বলতে চান? উচ্চবর্ণের লোকেরা ভেতরে ভেতরে সহজিয়াদের মদত দেয়নি কি আর? তবে পরে ঐ নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, শ্রীখণ্ড এইসব জায়গাতেই কেবল খাঁটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা ঘাঁতি গাড়ে; সহজেরা ছড়িয়ে যায় গ্রামে গ্রামে-আখড়ায় আখড়ায়। বিকৃতিও আসে তাদের মধ্যে। তারপর গড়ে ওঠে নানা বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়।

ঃ কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে এইসব উপসম্প্রদায় মাথা চাঁড়া দেয় বলুন তো?

ঃ একেবারে আঠারো শতকের শেষার্ধে। সেতা বোঝাতে গেলে আপনাকে সিদ্ধ বৈষ্ণব তোতারাম বাবাজীর ঘতনা বলতে হয়। শুনবেন?

ঃ অবশ্যই শুনবো। এসব বলবার মত যোগ্য লোক তো আপনিই, আমি বললাম।

ঃ বিনত মুখে সুকান্ত শুনলেন আত্মপ্রশংসা। তারপর খানিক ভেবে বললেন 'শ্রীনিবাস আচার্যের বংশের সন্তান রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন আঠারো শতকের মানুষ। ১৭৮১ সালে তাঁর দেহান্তর ঘতে। বলতে পারেন রাধামোহনই বাংলার শেষ বৈষ্ণব ইন্তেলেকচুয়াল। একবার বৃন্দাবনের দুই বৈষ্ণবের মধ্যে স্বকীয়া পরকীয়াবাদ নিয়ে বিতর্ক হয়। কোন্ পথ সঠিক? জয়পুরের রাজসভার বিচারে স্বকীয়ামত জেতে। তাতে প্রতিপক্ষ খুশি না হয়ে গৌড়ের পণ্ডিতদের মতামত দাবি করেন। জয়পুরের রাজ যখন তাঁর সভাসদ ও স্বকীয়াপন্থী কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যকে বাংলায় পাঠান; নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খাঁর দরবারে বিচার বিতর্ক হয়। রাধামোহনরে কাছে তর্কে হেরে কৃষ্ণদেব জয় পত্র লিখে দেন। ব্যস্ সেই থেকে বাংলায় পরকীয়া মত চেপে বসল। এখানে একতি কথা বলি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পরকীয়াবাদ এক শুদ্ধ নিস্কাম Conception। সহজিয়ারা কিন্তু সে Conception নেয় নি। তারা পরকীয়া বলতে বুঝল ও বোঝাল অবিবাহিতা সাধন সঙ্গিনী। ক্রমে কিশোরী ভজন ও পরস্ত্রী গমন হলো পরকীয়া সাধনার পক্ষে প্রশস্ত।"

—"স্বকীয়াতে বেগ নাই সদাই মিলন।

পরকীয়া দুঃখ সুখ করিল ঘতনা।।" ৪গ

শ্রদ্ধেয় শ্রী চক্রবর্ত্তীর 'গভীর নির্জন পথে' গ্রন্থতির 'দীর্ঘ ঋণগ্রহণের (৪ক—৪খ) ক্লান্তি দূর হলো সংলাপ নির্ভর নাত্যরসের যোগানে, সেই সাথে আমরা পেয়ে গেলাম কয়েকতি তথ্য, যা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আকর গ্রন্থগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১) সহজিয়াদের সূচনা মহাপ্রভুর আগে।

২) চণ্ডীদাসের বহুপদে অনেক ইঙ্গিত আছে।

৩) গৌড়বঙ্গে কৃষ্ণধামালীর একতা লৌকিক গল্প চালু ছিল রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই, আয়ান ঘোষকে নিয়ে—জয়দেব এই লৌকিক কাঠামো থেকেই রাধাকে নির্মাণ করেন।

৪) 'ভাগবত'-এ এমনকি 'মহাভারত'-এও রাধার নাম কোথাও নেই। দ্রৌপদী তাঁকে সভাপর্বে 'গোপীজন প্রিয়' বলে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

৫) বড়ু চন্ডীদাস কৃষ্ণ-রাধার অবৈধ দেহ কেন্দ্রিক গল্পকে অবলম্বন করে কামনা-আকুলতা আর বিরহ দিয়ে জনপ্রিয় করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-কে। এ কাহিনী পরবর্তীকালে সহজিয়াদের উজ্জীবিত করে।

৬) বৌদ্ধ সহজিয়া এবং তান্ত্রিক ভাবনার ক্রিয়াকলাপও ধীরে ধীরে সহজিয়াদের মধ্যে এসে যায়।

৭) সহজিয়ারা সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে ওঠেন নি। গোপনে অন্ত্যজবর্গে এর ধারা প্রবাহিত ছিল। ওতা ছিল গোপন আচরণ।

৮) মহাপ্রভুর পরে সহজিয়ারা সুগঠিত হন এবং সচেতন হয়ে ওঠেন।

৯) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, বৃন্দাবনের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে অনেক শূদ্রের মিলিত ধারায় সহজিয়া গোষ্ঠীর জন্ম।

১০) শ্রীখন্ডের নরহরি সরকারের 'গৌরনাগর সাধনা' এবং নবদ্বীপের 'মঞ্জরী সাধনা'—এই সংগঠনের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

১১) শ্রীচৈতন্যের গুহ্যসাধনাকে সামনে রেখে যেসব দেহ-কড়চা নামে অজস্র পুঁথি লেখা হয় তার পিছনে উচ্চবর্ণের বহু মানুষ যুক্ত ছিএলন—যদিও সামনে ছিল শূদ্ররা।

১২) সহজিয়ারা বিক্ষিপ্ত; খাঁতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, শ্রীখণ্ড—এসব জায়গায় ঘাঁতি গাড়ে। সহজেরা গ্রামে গ্রামে, আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ে; বিকৃতিও আসে।

১৩) আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে সহজিয়ারা নানা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান।

১৪) পরকীয়াবাদের পক্ষে রাধামোহন ঠাকুর এবং স্বকীয়া মতে পক্ষে কৃষ্ণদেব ভট্টাচর্য নবাব মুর্শিদকুলী জফর খাঁর দরবারে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। রাধামোহন জয়ী হন। এই রাধামোহন বাংলার শেষ বৈষ্ণব ইনতেলেকচুয়াল। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যর বংশের সন্তান। ১৭৮১ সালে ইনি লোকান্তরিত হন।

১৫) সহজিয়ারা পরকীয়া বলতে বুঝলো এবং বোঝালো অবিবাহিতা সাধন সঙ্গিনী। ক্রমে কিশোরী ভজন ও পরস্ত্রীগমন হলো পরকীয়া সাধনার পক্ষে প্রশস্ত।

১৬) গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পরকীয়াবাদ এক শুদ্ধ নিস্কাম Conception কিন্তু সহজিয়ারা এমন গ্রহণ করেন নি।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গুহ্য সাধনপন্থার সঙ্গে শক্তি বা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহ্য সাধনপন্থার পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রহিল না, দুয়ের মিলনও খুব সহজ হইয়া উঠিল। এই মিলন পাল পর্বের শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।" এ প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার নিষ্কাম পরকীয়াবাদ রূপে গৃহীত—সহজিয়ার সঙ্গে এর কোন বিশেষ সাদৃশ্য নেই। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে" গ্রন্থে বলেছেন "রাধা সম্বন্ধে আমাদের নিকত যাহা কিছু প্রাচীন তথ্য রহিয়াছে, তাহা মনে হয় সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই রাধার আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসার'। সাহিত্যাদি হইতে উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে রাধার ধর্মমতের ভিতরে প্রবেশ"৫—অস্বীকার করার উপায় নেই,—নরনারীর প্রণয়াকর্ষণ মানব ইতিহাসের সৃষ্টিধারায় সুনিশ্চিত ভিত্তি। আর সে বৃত্তি শৃঙ্গার বাসনার গভীরে সুপ্ত। সহজিয়া মতে তাকে ধর্মের আশ্রয়ে গ্রহণ করা হয়েছে।

....."রাধা কৃষ্ণলীলার ঐতিহ্য যেসব সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া গেছে, তার সবকতিই অর্বাচীন। — জয়দেবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী, কিম্বা এমনকি তাঁর সমসাময়িক কালেও সেই সব পরিকল্পনা এবং রচনা সম্পাদিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।"৬ ঐ সব পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বাধীন কবি কল্পনার যোগে গোস্বামী জয়দেব 'হরিস্মরণে মানস-সরসতা বিধান' এবং বিলাসকলা কুতূহল চরিতার্থ করতে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' রচনা করেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর জন্মখণ্ডে এই ঐতিহ্যের পূর্বানুসরণ। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-কে বাংলাদেশে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনার সার্থক কাব্য নিদর্শন বলে পরিচিত করেছেন।৭ বলা যেতে পারে লৌকিক জীবনচিত্রের প্রথম অভিজাত রূপায়ণ 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-এ 'বৈষ্ণবপদাবলী'-তে এর ক্রমপ্রসার ঘটেছে অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে। বৈষ্ণব কবিকে রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা ঃ

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান,
বিরহ তাপিতা হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে।
.....
.....এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করে লইয়াছ কার মুখ,—কার
আঁখি হতে।" ('বৈষ্ণব কবিতা ঃ 'সোনার তরী')

—রাধা-জীবনের কোন মানবী রূপের লোকায়ত ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে যে আলৌকিক ভাবরসঘন তিলোত্তমা মূর্তি রচিত হয়ে আসছে যুগে যুগে কালে কালে—সাহিত্যের নানা শাখায় — তা সহজিয়া ভাবনারই লোকায়ত অনুশীলন। কিশোর বয়সের অপরিণত রূপ-যৌবন-লালসা, অসংখ্য অনাবৃত সমাজ-বিগর্হিত আচরণ এবং শেষের বঞ্চনা—সব মিলিয়ে লোক স্বভাবের আদিম মূর্তিই যেন বড়ু চণ্ডীদাস অঙ্কন করেছেন। সহজিয়া ধর্মমতে এই শরীরী আকর্ষণকে বিশেষভাবে গুহ্যসাধনার মোড়কে চালানো হয়েছে।

সহজিয়া ধর্মসাধনায় রাই কিশোরী গুরুত্বপূর্ণ। এই রাধার উল্লেখ 'হরিবংশ', 'ব্রহ্মপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ' কোথাও নেই। 'ভাগবত'-এ এবং 'মহাভারত'-এ কৃষ্ণ প্রধান রূপে এলেও রাধা অনুপস্থিত। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-এ রাস ও রাধা দুই-ই আছে শ্রীকৃষ্ণ মদন বাণে জর্জরিত হয়ে রাধার সঙ্গে রতি মন্দিরে গমন করেন।

"এতস্মিন্নন্তরে তত্র সকাম সুরতোন্মুখঃ।
সুস্বাপ রাধয়া সার্দ্ধং রতিতল্পে মনোহরে।।
শৃঙ্গারাষ্ট্রপ্রকারাঞ্চ বিপরীতাদিকং বিভুঃ
নখ দন্তকরণাঞ্চ প্রহারঞ্চ যথোচিতং।।"

'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-এ রাধা-কৃষ্ণের বিহার বর্ণনায় রতিক্রিয়ার কথাই প্রধান; বৈষ্ণবের ভাবময়ী শ্রীরাধার অনন্ত প্রেমস্বরূপের কোন ইঙ্গিত নেই। 'পদ্মপুরাণ'-এ পাতালখণ্ডে ৪০তম অধ্যায়ে রাধার উল্লেখ আছে। অষ্টম শতকের কবি ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংসার' নাটকে রাধার উল্লেখ আছে, তবে তা প্রক্ষিপ্ত কি-না সন্দেহ। সে যাই হোক, সহজিয়া সাধনার পূর্বসূরী প্রসঙ্গে এ আলোচনার গুরুত্ব স্বীকার্য।

বাংলার সেন রাজাদের আমলে রাধা-কৃষ্ণ উপাসনার ধারা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-এ বসন্তকালীন রাসের বর্ণনা আছে—মনে রাখতে হবে 'ভাগবত-পুরাণ'-এ শারদীয় রাস বর্ণিত—অতএব জয়দেবের উৎস 'ভাগবত' নয়-এ নিশ্চয়ই প্রচলিত লৌকিক কৃষ্ণকথা।

স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্বের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য জগন্নাথলীলা প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। এই প্রেমাবতার কৃষ্ণরূপী জগন্নাথকে দেখে চৈতন্যদেবের ভাবসমাধি তো কিংবদন্তী। প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেল পুরীধাম। বাংলা আর ওড়িশার ভাব, ভাবনা, সংস্কৃতি, ভক্তি সর্বোপরি দুটি রাজ্যের প্রাণের ঠাকুর হয়ে গেলেন জগন্নাথ বা কৃষ্ণ—একই ভগবানের দুই রূপ।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনলীলা।, মথুরালীলার পর দ্বারকাধামে রুক্মিনী, সত্যভামা সহযোগে ষোলো হাজার একশ আট জন মহিষী সহ ঐশ্বর্য। মাধুর্য এবং বৈভবে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মন যেন সব কিছু থেকে বহুদূরে। একদিন রাতে রুক্মিণী, সত্যভামা—প্রধানা মহিষীগণ নিদ্রামগ্ন শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে 'রাধা' নাম শুনতে পেলেন। তিনি যে 'হা রাধে' বলে কেঁদে উঠলেন। বিস্মিত মহিষীরা তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি কিছুই না বলে সতর্ক করলেন, একথা জানতে চাইলে তারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে হারাবে।

কৌতুহল স্বভাবতই বেড়ে গেলো। জানার জন্য বলরাম জননী রোহিনীর কাছে গেলেন—রোহিনী প্রথমে না বলতে চাইলেও উপর্যুপরি অনুরোধে শর্তসাপেক্ষে রাজী হলেন। সেইমত বন্ধ কক্ষে মহিষীদের কাহিনী শোনাতে লাগলেন—দ্বারে প্রহরা দিচ্ছেন সুভদ্রা, যেন কৃষ্ণ-বলরাম আসলে তিনি ইশারা করেন বা দ্বারে করাঘাত করেন।

"শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে সব ঘটনার বিবরণ মাতা রোহিনী দিয়ে চলেছেন। অপার্থিব সেই লীলা মাধুরীর বর্ণচ্ছটায় দিকদিগন্ত যেন প্লাবিত হয়ে যেতে থাকলো। মহিষীরা সকলে ভাবে মগ্ন। রাজসভায় রাজকার্যে ব্যস্ত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। রাজকার্য ফেলে তাঁরা দুজনে অন্তঃপুরের দিকে ফিরে চললেন। বাৎসল্যলীলা, সখ্যলীলা পার হয়ে মাতা রোহিনী তখন মধুর লীলা বর্ণনায় উপস্থিত হয়েছেন। যাঁরা শুনছেন সকলে ভাবাবিষ্ট। এমনকি বন্ধ দরজার দ্বারী সুভদ্রাও সেই অপার্থিব লীলা মাধুর্যে আবিষ্ট—কৃষ্ণ বলরাম যে এসে গেছেন, মাতা রেহিনীকে যে সংকেত দিতে হবে সে কথা তাঁর স্মরণে নেই। বলার অবস্থাও নেই। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগিনী সুভদ্রার দুপাশে দাঁড়ালেন এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই অপার্থিব ব্রজলীলার বর্ণনা শুনতে লাগলেন। ভাবের আবেশে ক্রমশ চিন্তায় তনু বিগলিত হয়ে যেতে লাগল। শ্রীমতি রাধারানির প্রেমবৈচিত্র, লীলাবিলাস ভাবোল্লাসের বর্ণনা শুনতে শুনতে কৃষ্ণ বলরামের হাত পা সংকুচিত, চক্ষু বিস্ফারিত ও দেহ বিগলিত হয়ে যেতে লাগল। সুভদ্রা হাত পা অদৃশ্য হয়ে গেল। সুদর্শন চক্রের আকৃতি লম্বা হয়ে গেল। বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা বিস্ফারিত চোখ, নিশ্চল দেহ।"৮

মনে রাখতে হবে মনের গভীরে অভিমানের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম লেশমাত্র থাকলেও ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হওয়া যায় না। মাতা রোহিনীর প্রেম বাৎসল্যরসের প্রেম। মধুর রস যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অপরদিকে মহিষীদের মধ্যে রয়েছে আত্মাভিমান। জাতি, কুল, শীলের অভিমান। ব্রজের গোপাঙ্গনাদের তাঁরা শ্রদ্ধা করতেই পারেন না। তাই ব্রজলীলা মাধুরী তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেনি। এ জন্যে তাঁদের ভাব পরিবর্তন হয়নি। আমরা অনুমান করতে পারি লৌকিক রাধা কাহিনী তথা পরকীয়া কাহিনী জনমানসে কতদূর সমাদৃত হয়েছিল। সহজিয়া সাধনা তাই সুপ্রাচীন না হলেও প্রাক্ চৈতন্যকালীন—এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ থাকে না, তেমনি জগন্নাথদেবের মূর্তির পিছনে রাধা কাহিনীর এই সংযুক্তি সহজিয়া মাহাত্ম্যকে গভীরতা ও ব্যপকতা দিয়েছে সন্দেহ নেই।

জগন্নাথ রূপী কৃষ্ণ কাহিনীতে হিন্দুর চতুর্বর্ণের একত্র সহাবস্থানের তত্ত্বটিই এই প্রসঙ্গে মনে আসা স্বাভাবিক। প্রেমের এই সাধনায় সর্ববর্ণের সহাবস্থানে বলরামের রং সাদা তাই ব্রাহ্মণ বর্ণ, সুভদ্রা হলুদ তাই বৈশ্যবর্ণ, সুদর্শন লাল তাই ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং জগন্নাথ কালো তাই শূদ্রবর্ণ। সহজিয়া সাধনায় বর্ণবৈষম্য নেই।

আদিমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পদ ও পদ্য আখ্যান সম্বলিত আধুনিক ধারায় উপন্যাস—ছোটগল্প ও নাটক। সহজিয়া সাধনার পরকীয়া প্রীতি বা সহজে 'পিরীতি তত্ত্বে'র বণ্টনার ধারা এখনও অব্যাহত। এ আলোচনায় আমাদের অন্বিষ্ট সেটাই। এই তালিকা অনেক দীর্ঘ আমরা এখানে মিতায়তন তারাশঙ্করের 'রাধা', অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' এই ত্রয়ী উপন্যাসকে ফিরে দেখার চেষ্টা করব। ছোটগল্পের ভিড়ে 'চুয়াচন্দন' এবং নাটকের মধ্যে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'— এদের জন্য পরিসর কম। কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' এখানেও দেহসাধন থেকে প্রেমসাধনায় তৃপ্তি কথা বলা হয়েছে।

লোলাপাঙ্গী কন্যা তরঙ্গিনী বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করতে এসে ব্যক্তি সান্নিধ্যে নিজেবদলে গেছেন—দেহময়ী সত্তা প্রেমসত্তায় পরিবর্তিত। তাই বণিক পুত্র চন্দ্রকেতুর প্রশংসা বাক্যে তার প্রতিক্রিয়া মুজ্ার নয়—

"তরঙ্গিনী ঃ (হেসে উঠে) চন্দ্রকেতু, তুমি কাব্য পড়েছো! তুমি বিদজ -তুমি সজ্জন। কিন্তু আমি যা চাই তা কি তুমি দিতে পারবে? আমি চাই আনন্দ—প্রতিমুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমান্স—প্রতি মুহূর্তে রোমান্স। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি। (যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে ক্ষণকাল পরে) আমাকে মার্জনা করো। আমি অসুস্থ আছি। বিদায়।" (পৃষ্ঠা-৬২)

'রাধা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসকার তারাশঙ্কর লিখেছেন ঃ

"বাংলাদেশে মহাপ্রভুর যে বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্লাবন এনেছিল, জীবনকে সাগর সঙ্গমের মহাতীর্থে পৌঁছে দিয়েছিল, সে স্রোতোধারার মুখ তখন মজেএসেছে, ফলে দেশ-জীবনের অবস্থা হয়েছে বিলের মত। মাছেরা যেমন এক্ষেত্রে সাগর সঙ্গমে পৌঁছতে পারে না; সাগরের স্বাদ পায় না—বিলের জলতলেই চক্রাকারে পাক খেয়ে উছল মেরে অসীমের সীমা ও অতলের তল পাওয়ার ভ্রান্ত আস্বাদে বিভোর থাকে—মানুষেরাও তেমনিই আচার-আচরণ পালনের মধ্যেই পরম প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। বিলের জলে নিক্ষিপ্ত গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জনের লবণের স্বাদেই যেমন বিলের মাছের সমুদ্র জলের আস্বাদ বলে ভ্রম হয়—মানুষেরও ঠিক এই অবস্থা।"

—আমরা বলতে চাই সহজিয়া ফলভোগী মানুষ ও উপন্যাসের কাহিনীতে যেন প্রতিনিধি রূপেই এসেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চার ত্রিধারা—পদ—আখ্যান ও জীবনী কাব্যে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও মহাজীবনের তথা খণ্ডজীবনের নানা দিব্যভাবের প্রকাশ ঘটতে পারে, কিন্তু সহজ সাধকদের বিচিত্র উপাদানের সাধারণ সদস্যদের জীবন বিম্বন দেখতে হলে উপন্যাস—গল্প কিম্বা নাটকই উপযুক্ত মাধ্যম। তবে মনে রাখতে হবে বিশুদ্ধ তত্ত্ব সন্ধান কিম্বা সাধকের ঐশী অনুভব কোনো উপন্যাসের অন্বিষ্ট হতে পারে না।

কৃষ্ণদাসী সে যুগের সহজিয়া আবেগ বন্যার শিকার। সে ভাবছে ঃ

"কী থেকে কী হয়ে গেল! হয়তো তার জন্যে নিজের দায়িত্ব কম নয়। কিন্তু তবু মনে হয় এর উপর তার নিজের হাত ছিল না; নিজের হাত নেই। স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে। লোকে বলছে, সাঁতার কেটে তীরে উঠল না কেন? সাঁতার তো জানে! জানে বই-কি সাঁতার! এত বড়ো পাট—প্রেমদাস বাবাজীর পাট—সেই পাটের মা-জী সাঁতার জানে বই-কি। কিন্তু আশ্চর্য, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চরার টান থেকে কিছুতেই সে পাশ কাটিয়ে তীরে উঠতে পারছে না।

নিন্দা তো উঠেছে। চাপা যেন আর থাকছে না। শুধু তার শ্বশুরের সাধনা সিদ্ধ পাটের উপর শ্রদ্ধার জন্য লোকে এখনও তাকে পতিত করতে পারে নি। উঁচু স্তরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সমাজের লোকেরাও প্রকাশ্যে কোন কথা বলতে পারে না।"৯ক

—এই স্বগতোক্তিতে সেকালের সহজিয়া সাধনায় সাধারণ মানুষের জীবনোপলব্ধি অবশ্যই আভাসিত হয়। লেখক স্পষ্ট করেই বলেছেন "পরকীয়া সাধন, কিশোরী ভজন দেশে চলছিল, কিন্তু সে চলছিল গোপনে; চলছিল গুরুদের ইশারায়। সংসারে সাধনা করলেই সিদ্ধি মেলে না। শতকরা নিরানব্বই জনই ভ্রষ্ট হয়; এবং তাই হত। কিন্তু তাতে ভ্রষ্ঠ যারা হত তারা দুঃখও পেত লজ্জাও পেত; বুক ফাটিয়ে কেঁদে গোবিন্দের কাছে কামনা জানাত যেন আগামী জন্মে সিদ্ধি মেলে।"৯খ

'রাধা' উপন্যাসে কৃষ্ণদাসী গোপাল দাসের সাধন সঙ্গিনী কিন্তু সাধনার ফুল তার ফলে পরিণত হয়েছে নিজে সে কিশোরী থাকতে পারেনি—জন্ম হয়েছে মোহিনীর। অপবাদ অবহেলার মধ্যে সে ভেবেছিল নিজেকে ও মেয়েকে জগন্নাথের পায়ে সমর্পণ করবে কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। নিজেই একদিন মহুয়া ফুলের নেশায় পাগল হলো। মোহিনীকে জানালো সহজিয়া প্রেম সাধনার গোপন রহস্য; কিশোরী ভজনের কথা ঃ

"বাইরে যেমন নানান আচার ও ধর্মচরণের পদ্ধতির সঙ্গে, কোন একটি নিরীহ বৈষ্ণব মহান্তের সঙ্গে তার
মালাবদল হবে, তেমনি ভিতরে কোঠাঘরের উপরে আতর—গোলাপ-বসন-ভূষণের সমারোহের মধ্যে
বাজারের কোন বিলাসী ধনী এসে তার সঙ্গে বাসর সজ্জা পাতবে।"

এতো গেলো মায়ের শিক্ষাদান—সহুতে জীবনের ইতিবৃত্ত আর মোহিনী?

"মোহিনী চুপ করে শুনছিল। মায়ের কথাগুলির মধ্যে একতি মারাত্মক মোহ ছিল। তার কিশোরী-মন তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, শুনতে শুনতে অঙ্গ যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ফুল কুড়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার।"

ঠিক সেই সময়েই অজয়ের পাড়ে কাছাকাছি দূরত্বে পালতোলা নৌকায় দেখল ঃ

"অপরূপ সন্ন্যাসী। বৈষত্ব। চূড়ার মত চুলের ঝুঁতির উপর সাদা ফুলের মালা জড়ানো। কপালে তিলক। বাহুতে তিলক। সবল দীর্ঘকায় মানুষ। প্রশস্ত বক্ষতি। তার উপর তুলসীর মালা আর ফুলের মালা জড়াজড়ি করে দুলছে। দেহবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু তাতে অপরূপ একতি কান্তি আছে, আয়ত দুতি চোখ মুখশ্রীকে অপরূপ করে তুলেছে; শান্তি প্রসন্ন মুখশ্রীতে একতি গম্ভীর উদাসীনতা থম্‌থম্ করছে।"

মা-মেয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মত। কৃষজ্দাসী অন্যান্য গোস্বামী মোহান্তদের সঙ্গে তুলনা করছেন। ইনি যিনিই হোন না কেন 'বড় সুণ্ডর নবীন মহান্ত'। গৌর যেন নবকলেবর ধরে আবার অবতীর্ণ হয়েছেন পাতকী তারণের জন্য।'৯গ

কিন্তু মোহিনীকে দেখে অবাক ও বিরক্ত;

"মেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ে না।

কৃষজ্দাসী তার হাত ধরে তানলে ক্ষ্ম মর্-মর্-মর্। প্রণাম

কর, প্রণাম কর।" (৯ঘ)।

মোহিনী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি নতজনু হয়ে বসে মাথাতি লুতিয়ে দিলে। পলাশফুল গুলি ঝর ঝর করে পড়ে গেছে মাতিতে ছড়িয়ে।

—এখানেই বোঝা যাচ্ছে মায়ের অস্মিতা বোধ এবং মেয়ের আত্মবিলাপ ভিন্ন মুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই দুজনকে ব্যর্থতা ও সিঙি র লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। জান্নাথ রূপী কৃষজ্লাভ করতে হলে লেশমাত্র অস্মিতা থাকলে চলবে না। মোহিনী সিঙি পেলেও কৃষজ্দাসী উন্মাদিনী হয়ে গেলেন-উপন্যাসতির ক্রমাগ্রসরমানতায় জপন্যাসিক অসামান্য সমস্ত জ্ঞানও কুশলী বর্ণনা-সহায়তায় তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রাধা উপন্যাসে ৩৪ পৃষ্ঠায় কৃষজ্দেব ও রাধা মোহন ঠাকুরের বিচার সভার উল্লেখ আছে। মুরশীদ কুলী খাঁর সামনে মোকাম সালিহাতিতে বৈষত্ব আচার্য শ্রীনিবাস ঠাকুরের নাম মজ্তকে, এই বিচার সভা বলেছিল। জপন্যাসিকের ভাষায় ক্ষ্ম

"ছ মাস বিচারের পর একদিন আচার্য কৃষজ্দেব স্তব্ধ হলেন। চোখ থেকে তাঁর জলের ধারা নেমে এসেছে। চৈতন্য স্বরূপ একমাত্র পুরুষের সেই বিশ্ববিমোহন মূর্তি তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তি রাধার মত তাঁর বাঁশী শুনে পাগলিনী। বিরহে ব্যাকুল। সুখ নাই, সান্ত্বনা নাই, তৃপ্তি নাই, ওই মোহন বাঁশুরিয়া কে না পেলে সব শুন্য-সব শুন্য-সব শুন্য। সেই একমাত্র আপন। কিন্তু সে আপনার নয়, নিতম্ব নয়, বস্তুময় সংসার শতবন্ধনে বেঁধে রেখেছে প্রাণ রূপিনী নায়িকাকে। তাকে অভিসার করতে হয় গোপনে, নিশীথ রাত্রে বর্ষণমুখর দুর্যোগের মধ্যে। ও দিকে বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনির আর বিরাম নাই। তিনিও ব্যাকুল। অধীর। প্রাণময়ী রাধা ছাড়া তাঁর লীলা ব্যকুলতার পরিতৃপ্তি কোথায়।"৯ঙ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আবার কৃষজ্দাসীকে দেখি মাধবানণ্ডকে যে কামনার দৃষ্টিতে দেখে লাভ নেই—ভাবনার এইমাত্র উত্তরণ ঘতেছে—অক্রূরের হাত থেকে নিজের মেয়ের উঙার—বাসনাই তাকে পেয়ে বসেছে। ওদিকে মোহিনীর মনে একতিই অস্ফুত বাসনা—"সে শুধু প্রমাণ করবে, তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবে গোসাঁই, তার সারা অঙ্গ সেই আশীর্বাদে থর থর করে কেঁপে উঠবে।" (পৃষ্ঠা ৬৫)

তমাস হার্ডি তাঁর 'Far From The Madding Crowd'— উপন্যাসের ভূমিকায় লেখেন ক্ষ্ম

"I had thought to reserve to the horizons land scapes of a partly real, partly dream country."

'রাধা' উপন্যাসও সবতা বাস্তব নয়। রাধার মূল ঘতনা ঘতেছে বীরভূম বর্ধমানের সীমানায়। অজয় নদীর উভয় পারে। পশ্চিমে ইলামবাজার থেকে পূর্বে জয়দেব—কেণ্ডুলি আর উত্তরে হেতমপুর থেকে দক্ষিনে শ্যামরূপার গড় তথা মনকর অঞ্চল এই উপন্যাসের পতভূমি। কাহিনীর অগ্রগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে কোচবিহার থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত। এমন কী মহারাষ্ট্র ও দিল্লীর পতভূমি এসেছে 'রাধা' উপন্যাসে। পরোক্ষে রাজস্থান এলাহাবাদ-মধুরার কথাও এসেছে। উপন্যাস খানি 'প্যারাবলিক' বা 'হাই প্যারাবলিক' অর্থাৎ উপবৃত্তীয় কাঠামো পেয়েছে। কাহিনীর ভূগোলে এর চরিত্রাবলীর পর্যতন তাই খানিকতা হার্ডির শৈল্পিক রহস্যের পথ ধরেই গড়া মনে হয়।

ইলাম বাজর হয়ে শিষ্যদের নিয়ে মাধবানণ্ড উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তে প্রবেশ করেছেন। অজয়ের উজন-স্রোতে কাতোয়া-উঙারণপুর পেরিয়ে পালের নৌকায় কিছু সঙ্গী সন্ন্যাসী নিয়ে মাধবানণ্ডের প্রবেশ। রাধা উপন্যাসের এই উঙারণ পুরকে কেন্দ্র করেই লেখা আর—এক উপন্যাস—অবধূতের 'উঙারণ পুরের ঘাত'। এখানকার নিতাই বোষ্টমী ও কিশোরী ভজনার সাক্ষী তারও উত্তোরণ ঘতেছে প্রেমের অশঙ্কিনী মূর্তিতে। দেহসাধনার সহজ পথেই নিতাই বোষ্টমী সহজিয়া সাধিকা।

রাধা উপন্যাসের কৃষজ্দাসী মোহিনীকে যে শিক্ষা দিয়েছিল সেই ধারণা ও সণ্ডেহ যেন নিতাই বোষ্টমীর চরিত্রকে ঘিরে রূপায়িত। নিতাই বোষ্টমীর প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়বে তার সুললিত কণ্ঠ আর কেবল আত্ম সংযম নয় আত্মরক্ষার শক্তিও তার চরিত্র বৈশিষ্ট। "কাচা হলুদের

সঙ্গে অল্প একতু চুন মেশালে যে রঙ দাঁড়াই সেই রঙে রঙিন ছিল নিতাই। তার ওপর সেই ছোট্ট শরীরখানির বাঁধুনি ছিল অতুত, সব খাঁত খোঁত গুলি তীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট। পেছন ফিরে চলে গেলে যাত বছরের তত্ত্ব দর্শী মশাই থেকে তের বছরের ফচকে ছোঁড়া নাপিতদের নুলো পর্যন্ত সবাই একবার বোষ্টমীর কোমরের নিচে চোখ বুলিয়ে না নিয়ে স্থির থাকতে পারত না। 'অয় রাধে, দুতি ভিক্ষে পাই মা' বলে যখন গেরস্তের দরত্তয় গিয়ে দাঁড়াত নিতাই, তখন বৌ-ঝিরা তার হাত ধরে তেনে নিয়ে যেত বাড়ির ভেতর। পিঁড়ি পেতে বসিয়ে মুড়ি নাড়ু খাইয়ে পানের খিলি হাতে দিয়ে ত্তনে নেবার চেষ্টা করত, কি উপায়ে বুকের সম্পদ বোষ্টমীর মত চিরকাল বত্তয় রাখা যায়। মাথার চুল কালো হয় কি করে? কোমর ছাড়িয়ে চুল নামবার ওযুধ কি. কি দিয়ে কাত্তল বানালে বোষ্টমীর মত চোখের পাতা কালো হবে? সবাই খোঁত করত, ওর কুড়া ত্তলির ভেতর পুরুষকে হাতের মুঠোয় পোরবার ত্তড়ি-বুতি লুকানো আছে কিনা।"১০

যেমন কৃষত্তদাসী বলেছিল মোহিনীকে একতা বাইরের পরিচয়ে সাদামাতা নিরীহ বোষ্টমকে নিয়ে ঘর বাঁধার কথা। আর গোপন কথাতি চেপে রাখার যে সহত সাধনার রীতি, তা এখানেও উ পস্থিত।

"দশ ক্রোশ পশ্চিমে নানুনের কাছাকাছি কোনও গ্রামে

ছিল ওদের আখড়া। বাবাত্তী চরণ দাস আখড়া বেঁধেছিল

নিতাই কে নিয়ে না নিতাই ঘর তুলেছিল চরণ দাসকে নিয়ে

তা ঠিক করে বলা অসম্ভব। আখড়া বাঁধবার গরত যারই

আগে হয়ে থাকুক না কেন, আখড়া চালাত কিন্তু নিতাই দাসী। গাঁত্ত তেনে পড়ে ঘুমোত।........একবার চোখে মেলে

দেখবেও না তার বোষ্টমী কোথায় যাচ্ছে, কি করছে;

কি দিয়ে কেমন করে চালাচ্ছে আখড়া।"১১

তার ভক্ত সংখ্যা নিতেও ত্তনত না। মুকুঔপুরের মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর আর রামহরি ডোমের ছোত শালা—পঙ্কেশ্বর—সবাই তার চোখের ইশারায় সাপের মাথার মনি আনতে ছুতে যেত। বিযুত্তিকুরির ত্তদেব ঘোষালের ছ'বারের পুঁচকে বউ বোষ্টমীকে দুতো কথা শোনাবার ত্তন্য হা-পিত্যেস করে বসে থাকতেন। 'নিতাইয়ের ডবল লম্বা খন্তা ঘোষ ডাকত তাকে ছোড়দি বলে।" একবার বৈরাগ্য তলার মেলায় ঘুষিয়ে পাঁচতা লোকের নাক থেবড়ে দিয়েছিল সে। তারা নাকি বোষ্টমীর নাম নিয়ে রসিকতা তুড়েছিল খন্তার সামনে। সেই দুর্দান্ত খন্তাও বোষ্টমীর কাছে বসে ছোত ভাইয়ের মত এসে মুড়ি চেবোত, মনের কথা বলত। সেই নিতাই কিনা শ্মশানে কাতিয়ে যেত এক-একবারে পাঁচ-সাতদিন। আর তা না করবেই বা কেন? গোঁসাইকে যে নিতাই কৃষত্তরূপে চায়!

"থুঃ থুঃ করে থুতু ফেলে নিতাই বলে—'খালি পচা পাঁক আর নোংরা ত্তল। ত্তলে রক্ত দোষ ত্তেঁক কিলবিল করছে, ছুঁতে গা ঘিন ঘিন করে। কোনও ঘাতে আমার কলসী ভরা হল না গোসাঁই—আমার কলসী শুকনোই থেকে গেল চিরকাল।"

নিতাই-এণ উপলব্ধি ক্রমাগত গভীর ত্তীবনবোধ উজ্জীবিত

"কেউই আমায় চায় না। আমার খোঁতে কেউ আসে না আমার কাছে। সবাই আসে আমার এই শত্রুর কাছে। বাপ-মায়ের হাড় মাংস থেকে পাওয়া এই হাড়-মাংসের বোঝাতার লোভে সবাই ছোঁক ছোঁক করে ঘোরে আমার পেছনে। কানের কাছে ফিস ফিস করে-সোনা-দানায় গা-গতর মুড়ে দেবে; বাড়ির দাসী চাকর কোনও কিছুরই অভাব রাখবে না। খেংরা মারি সোনা-দানা-বাড়ি-ঘরের মুখে হ্যাংলা কুকুরের পাল।"

শুধু নিতাই নয় চরণদাস ও অনুরোধ করে ক্ষ্ম

"চল গোঁসাই আমাদের সঙ্গে। যেখানে তুমি নিয়ে যাবে সেখানেই যাব আমরা। আত্তীবন তোমার সেবা করে কাতাব।" যথার্থ ভালোবাসার উপলব্ধি হয়েছে চরণ দাসের; সে যে নপুংশক তাই আকুল আবেদন ত্তনায় ক্ষ্ম

"এখানেই আমায় রেখে যাও গোঁসাই। আমি খুব শান্তিতে থাকব। তবু ত ত্তনব কোথাও না কোথাও তুমি সুখে আছ নিতাইকে নিয়ে। তাতেই আমার মনের ত্তালা তুড়োবে।" আসল অর্থ শ্মশানভৈরব নিতে এবং পরে পাঠকরা বুঝতে পারেন-যখন তাকে চিতায় তুলে দেওয়া হক্ষ্ম

"দেখলাম—একতা অসমাপ্ত রচনা। সৃষ্টিকর্তার মনের ভুল। মনের ভুল নয় শুধু, একতু গাফিলতি। অতি-বৃত্ত ওস্তাদের হাতের কাতে খুঁত থেকে গেছে।

বাবাত্তী নর নয়, নারী নয়। কিছুই নয়। বিধাতার অমার্তনীয় ভ্রান্তির নিষ্ঠুর সাক্ষ্য।" (পৃষ্ঠা-১২৮)

এ যেন আইহন কেই মনে করিয়ে দেয়। শুধু এত্তন্যই এই উপন্যাস কে সহত্তিয়া সাধনার উদাহরণস্থল হিসাবে আমরা বেছে নিই নি। ১১১ পৃষ্ঠায় আগমবাগীশ তো সরাসরি কথক গোঁসাইকে ত্তিজ্ঞাসা করেছিলেন কখনও তার চোখে পড়েছে কি-না সেই রূপের ছায়া ঃ

যুবতি মনোহর-বেশম্

কলয় কলনিধিমিব-ধবনীমনু—

পরিণত রূপ বিশেষম্।"

চরণ দাস গেয়েছেঃ "মনরে বুঝাইলাম কত—

হইলাম না তার মনের মত

না পাইলাম সে চিকন কালিয়া।"

গোঁসাই কে অনুরোধ করেছে ক্ষ্ম "নিতাই দাসী কোনও দিন ছোত কাত করতে পারে না এই বিশ্বাস নিয়েই যেতে পেরেছে চরণ দাস বৈরাগী—এই কথাতুকুই শুধু তনিয়ে দিও তাকে। এই আমার শেষ আবেদন তোমার কাছে"।

শব শয্যার উপর আসন পাতা ভৈরবই নিতাই-এর আরাধ্য দেবতা নিরুত্তাপ নীরস সে মানুষতাকেই ভালোবেসেছে নিতাই। গুনগুন করে ওঠে প্রেমিকের কানের কাছে ক্ষ্ম

বঁধূ হে-নয়নে লুকায়ে থোব।

প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,

হৃদয়ে তুলিয়া লব।।

তোমার নয়নে লুকায়ে থোব।।

শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে—

ও পদ করেছি সার।

ধন তন মন, তীবন যৌবন,

তুমি সে গলার হার।।

শয়নে স্বপনে, নিদ্রা তাগরণে

কভু না পাসরি তোমা।

অবলার ত্রুতি, হয় শত কোতি—

সকলি করিবে ক্ষমা।।"

তারপর সেই অন্তিম আকুতি "গোঁসাই আমি এসেছি। পালিয়ে এসেছি গোঁসাই। আর পারি না আমি, আর পারি না। চল গোসাঁই পালিয়ে চল এখন থেকে। তোমায় নিতে এসেছি। তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাব।"

চরণদাস ভালোবেসেছিল—সে তাই নিতাইকে ভুল বোঝেনি কিন্তু পুরুষের কামনার দৃষ্টি গোসাঁইকে সণ্ডিজ করলো কুমার বাহাদুরের ভক্তি বিনত দানকে ভোগের প্রসাদ বলে মনে করল নির্লজ্জ ভাষায় বিঁধল নিতাইকেঃ

"এতকিছু দিয়েছে যখন তখন মণ্ড করনি ওর অণ্ডর মহলে ঢুকে। মরুক গা বেতা চরণদাস শুকিয়ে। আর সে তো কায়মনো বাক্যে বিশ্বাস করে বসে আছে যে কুমার বহাদুরের অণ্ডর মহলের ভেতর বসে তুমি শুধু নামত্প করে দিন কাতাচ্ছ! হা হা হা হা হা হা—এখন যদি একবার দেখাত পারতাম তাকে তোমার সোনাদানা গয়না গাঁতির বহর। হা হা হা হা হা হা—এ সমস্ত শুধু নামত্প করেই পাওয় যায়—অণ্ডরমহলের ভেতর বসে--হা হা হা হা—এই বিদ্রুপে আর অপমানের খোঁচায় পাল্তে গেল নিতাইঃ

দুতো আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে তার দুই চোখ থেকে। বেশ ত্বলা করে উঠল আমার চোখ মুখ।"—কলহান্তরিতা রাধার মত, গহনা ছুঁড়ে ফেলে, গোঁসাইকে সুবর্ণের দেহ "গ্রাস" করার অভিযোগ তুলে তারপর ধীর কণ্ঠে পুর্নবিবেচনার সুর ঝরল ক্ষ্ম

"যা পাবার আমি পেয়েছি। আমি যদি অপরের দেওয়া গ য়নাগাঁতি পরি বা কারও অণ্ডরমহলে গিয়ে ঢুকি তাহলে যে তোমার বুক পুড়ে যায়—এইতুকু তো তনতে পারলাম। এই আমার সব পাওয়ার বড় পাওয়া হলো। আর কখনও ত্বলাতে আসব না তোমায়। প্রেতের দৃষ্টি তোমার চোখে। মরণের ওপার থেকে তীবনকে দেখ তুমি। শুধু সণ্ডেহ আর অবিশ্বাস আর মনগড়া মিথ্যা অভিমান। আচ্ছা, ওই সব নিয়ে শান্তিতে বসে প্রেতের রাতত্ব চালাও তুমি—"

নিতাই তনতো গোসাঁই তাকে ভুল বুঝেছে কিন্তু কথক গোসাঁই-এর তনা দরকার নিতাই চরণ দাস বাবাত্রীকে ঠকায়নি-স্বৈরিনী থেকে পীড়ন করে নি—এই মানুষতাকে। নিতাই তার দায়িত্ব পালন করেছে। নিতাই ফিরে এল, সে ইঙ্গিত তনাল ক্ষ্ম

"আচ্ছা আমি যদি তোমার বাবাত্রীর সঙ্গে আবার দেখা হয় ত তাকে বোল যে মড়া নিয়ে মেতে থাকার ফুরসত নেই আমার। ত্রান্ত দের বেশি একতু শান্তি দিতে পারি তাহলেই আমি নিতে মরে শান্তি পাব। মড়ার আবদার তুমিই শোন বসে বসে গোসাঁই। ও বিলাসিতা আমার পোষাবে না।" (পৃষ্ঠা-১২৫)

যুগল চিতায় পুড়ে শেষ হলো খন্তা ঘোষ আর চরণ দাস বাবাত্রী। নিতাই যে সত্যিই রাধা—চরণদাস যে 'বিধাতার অমার্তনায় ভ্রান্তির নিষ্ঠুর সাক্ষ্য'। তা তনার পরেই কথক গোসাঁই এর শ্মশান সাধনা শেষ হলো। শ্মশান ভৈরব এবার শ্যাম রূপে অবতীর্ন হবেন।

"খন্তা ঘোষ আর চরণ দাস। সাদার হাড় আর কালো কয়লা তুলতে লাগল একসঙ্গে। চরণ দাসের লজ্জা লুকিয়ে ফেললাম। সেই চিতা থেকে একখানা কাঠ তেনে নিয়ে গুঁতেদিলাম গদিতায়। ..... রাশীকৃত ভুল দাউ দাউ তুলে উঠে উঞারণপুর ঘাতের অনেকতা আঁধার ফিকে করে আনলে। সেই আগুনে পুড়তে লাগল কুমার বাহাদুরের গহনাগুলো আর কাপড় খানা। পুড়ুক—অনেক আছে তাঁর।" (পৃষ্ঠা ১২৮)

—ভুল বোঝা কেতে গেছে। গহনা মূল্যবান নয় প্রেমই মূলধন শ্মশান ভৈরব এখন প্রেম ভিখারী—প্রায়শ্চিত্ত পিয়াসী এর পর সে কি করবে?

"এগিয়ে চললাম বড় সড়ক ধরে।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই তের পেলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কে হাঁতছে আমার পাশে পাশে!

তারপর ধরলে আমার একখানা হাত।

কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—চল, পা চালিয়ে চল একতু। আঁধার থাকতে থাকতে পার হয়ে যাই এই পথতুকু।

নিশ্চিন্ত হয়ে পা চালালাম। হাত ত ধরেই আছে, আর ভয় কি!"

সমুদ্র আহ্বান করছিল তাই কি নদী এসে মিশল সে অনন্তে? নিতাই বোষ্টমীর নিরবিচ্ছিন্ন 'পীরিতি' প্রহরা সার্থক হল ক্ষ্ম

"সেই প্রেমাতুর তানে

যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে

ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে

ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে

মোর দিকে, বহি নিত মৌন ভালোবাসা

ওই গানে যদি—বা সে পায় নিত ভাষা,

যদি তার মুখে ফুতে পূর্ণ প্রেমত্যোতি—

তোমার কি তাঁর বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি?"

রাধা (১৩৬৪) উপন্যাসে মোহিনী ফুলের সাধনার হয়ে ওঠা ফল। কিশোরী ভত্না করতে গিয়ে মহান্ত গোপাল দাস বাবাত্তী তম্ম দিয়েছিলেন মোহিনীকে। কিশোরী মাতার সন্তান মোহিনী। তার বাবা গোপাল দাস। গোপাল দাস প্রেমদাস বাবাত্তীর শেষ সেবাদাসীর গৃহাশ্রমের সন্তান। গোপাল দাসের সাধন—সঙ্গিনী কৃষতদাসী বাঁধনহীন সম্পর্কের মধ্যে মোহিনীর তম্ম দিয়ে বাঁধা পড়ে ছিল। শ্বশুর প্রেমদাস আর শ্বাশুড়ী রাইদাসী বুক দিয়ে আতকে রাখল কৃষতদাসী আর মোহিনীকে। মোহিনীকে মাধবানঔ স্বাভাবিক কারণেই ভুল বুঝেছেন। কৈশর স্মৃতি দিয়ে বিচার করেছেন কৃষতভামিনীর সঙ্গে কৃষতদাসীর তুলনা করে। নিকৃষ্ট ভেবেছেন স্বভাবতই এরা প্রেমহীন দেহ কামনা সর্বস্বা।

কিন্তু মোহিনী? সে তো প্রথম দর্শন থেকেই মাধবানঔকে হৃদয়ে ধারণ করেছে। প্রত্যাখাতা হয়েছে কিন্তু হৃদয়ে কীভাবে যেন দাগ পড়েছে মাধবানঔের। গোপালনঔকে মুহূর্তে হত্যা করছেন অনুভব করেছেন তাঁর মন আর মস্তিস্ক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মোহিনীকে বর্তন করেছেন বাইরে কিন্তু অন্তর মোহিনীময়। মনে বল সঞ্চার করতে ভাবছেন ক্ষ্ম

"হে কংসারি, তুমি বল, তুমি বল, তম্ম থেকে শৈশব, তীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তুমি যোগী। চৈতন্যময় প্রতিক্ষণের ভগ্নাংশেও তগ্রত। তোমার তীবনে রাধা ছিল না, রাধা নাই, রাধা নাই। রাধা তোমাকে মোহগ্রস্ত করতে এসে ব্যর্থ হয়ে চিরকাল কেঁদেছে-কেঁদেছে।"

পলাশীর যুঙ এখনও চারমাস পুরো হয়নি। রাতমহল, শকরিগলিঘাত পার হয়ে এসেছে নৌকো। গৌরীনাথ দর্শন করে মুঙ্গের-এর পথে এল সুলতান গঞ্জ। এই সময় প্যারেবাঈ ওরফে মোহিনীর সঙ্গে অসুস্থ মাধবানঔের সাক্ষাৎ। সেবা, আসক্তি কৌতূহল-মোহিনীর 'রাধা' হয়ে ওঠা। তার ভাষায় ক্ষ্ম

"দেহ আমার মূল, পরমাত্মা আমার ফুল। মূলের তিয়স না মিতলে ফুল ফুতবে কেন মহারাত? ফুল ফুতলে ভ্রমর আসে গুরু ভ্রমর ভগবান। তখন ফল হয়, তুমি জ্ঞানী। আমি মূরখ দেহাতী ছোকরী। অপরাধ নিওনা। সংসারে যে ভালো কথা বলে সে-ই আমার আপনতন; যাকে বুকে ধরে বুক তুড়াই সেই আমার পরমধন। ধমর কি তা তনি না গোসাঁই, যে করমে মনে আহ্লাদ; দেহে আহ্লাদ তুমি খুশি, তারা খুশি, তাই আমার ধরম।" এ যেন সহত সাধনার লোকায়ত ভাষ্য।—এর সত্যতা জ্ঞানের বাধায় (পৃষ্ঠ ২০৩) বিদ্বজ্জন বুঝতে অক্ষম। গোবিঔ মোহিনীর উপলব্ধি ক্ষ্ম

"সিঞি কাকে বলে তনি না গোসাঁই, তবে আনঔ পেয়েছি।

দুঃখে যখন কাঁদি তখনও সুখ পাই। সেও সুখ হয়ে ওঠে।

সে যদি সিঞি হয় তো পেয়েছি।"

তারাশঙ্কর তনিয়েছেন এক সময় মাধবানঔ 'সন্ন্যাসী সম্ভাষণ' বদলেছেন সন্ন্যাসিদের একদা বলতেন 'নমো নারায়ণ' এখন বলেন

'আনঔ রহো' এই আনঔ সহজিয়া ভাবের শেষ কথা—একেই বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় 'মহাসুখ'।

উপন্যাসের শেষ পর্বে অসুস্থ মৃত্যু পথযাত্রী মাধবানঔ "অকলুষ আনঔে অসঙ্কোচ বাহু বিস্তার করে প্রার্থীর মত নতজানু হয়ে বসলেন, এতক্ষণে কথা বের হল, তুমি রাধা—আমার রাধা!" (২০৬) তাদের মিলন মরণ যাত্রাপথে। নিজের দলেরই উন্মত্ত হাতির পায়ের নিচে। নিরীহ গ্রামকে বাঁচাতে গিয়ে। তাঁর দেহের উপর পড়ে দেহ ত্যাগ করেছে বাঁশরীওয়ালী।

"কোলাহল উঠেছে বাঁশরীওয়ালী প্যারের আশ্রমে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুতে আসছে লোক। বাঁশরীওয়ালী বৃণ্ডাবন যাচ্ছে। সাধন পূর্ণ হয়েছে। সাধুর বেশে স্বয়ং শ্যাম এসেছিলেন নিতে। মণ্ডিরের সামনে রাশি রাশি ফুলে ঢাকা দুতি শব।"

উপন্যাসের অন্তিম বর্ননা অপরিবর্তিত রূপেই অনবদ্য ক্ষ্ম

"ও সে গোপন মনের গুপ্ত বৃণ্ডাবন

হোক না লক্ষ কুরুক্ষেত্র

বৃণ্ডাবনে অহরহ যুগল মিলন।

লোকে আজও গান গায়। গায় ওই বাউলেরা।"

এবার দেখব সহজিয়া প্রেমের ব্যর্থতা সাধারণের জীবনকে কেমন কলুষকালিমা লিপ্ত করে—রক্তাক্ত করে—এমন কি আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। গড় শ্রীখণ্ড (মার্চ-১৯৫৭); অমিয় ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস। চিকণ্ডির বুধেডাঙা গ্রাম। 'গোসাঁইয়ের বেতা ছিদাম' তার বাবা কেষ্টদাস বোষ্টমের দুজন বোষ্টমী ছিল। শ্যালিকা সম্পর্কের পদ্ম এখন তার সাধন-সঙ্গিনী। বয়স তার নিতান্তই কম। পুত্র ছিদামের মতই। রামচন্দ্র কেষ্টদাসের সখা—সৎ-ধর্মপ্রাণ কর্মঠ চাষী এবং গোবৈদ্য। সে পদ্মকে 'কন্যে' সম্বোধন করে।

কেষ্টদাসের এখন বয়স হয়েছে—কৃষজনাম তার বার্ধক্য কম্পিত গলায় পদ্মর মনে আবেশ সঞ্চার করে না। হাসি পায়। আবার চাষের কাতে পদ্ম যখন পুত্র ছিদামকে সাহায্য করে তখন কেষ্টদাসেরও মনে হয়। পদ্ম তাকে এমনি করে সাজিয়ে দিক। কিন্তু তা হওয়ার নয়; কেষ্টদাসের প্রস্তাবে সে হেসেব বলে "হাত মুখ ধু আসো গা, খাবার দেই। চালভাজা গুঁড়া করে কলা মোয়া বাঁধে রাখছি। কোষ্টদাস বুঝতে পারলে সে আর পদ্মর প্রণয় ভাগী নয়। লেখক ধীরে সুস্থে এই সম্পর্কের হিম শীতলতা ব্যাখ্যা করেছেন ক্ষ্ম "কেষ্টদাস একতি বাধ্য ছেলের মত গেলো। কিন্তু কোন একতি অনির্দিষ্ট অসার্থকতায় তার মন সংকীর্ণ হয়ে রইল। পদ্মর স্বাস্থ্য ও ছেলের যৌবনের পাশে তার রোগ ও বার্ধক্যজীর্ণ দেহ বারংবার তুলনার মতো মনে ফুতে উঠতে লাগলো।"

কিছুদিন পরে কেষ্টদাস হাতে গিয়েছিলো দীর্ঘদিন সে এ পথে চলেনি। হাতে পৌঁছে সে বুঝতে পারল সংসারের প্রয়োজনের সঙ্গে সে পরিচিত নয়। তবু পদ্মার প্রতি তার কর্তব্য সচেতনতায় "একগাছি চুল বাঁধবার ফিতে কিনে খুশি খুশি মুখে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে সে থেমে দাঁড়ালো। শোবার ঘর থেকে ছিদাম আর পদ্মার হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে।"

সহজিয়া সাধনার তত্ত্বকথা জীবনের ক্ষেত্রে খাতে না। কেষ্টদাসও এই আত্মযন্ত্রণা থেকে রেহাই পায়নি। তার চেষ্টা গুলি এই রকম ক্ষ্ম

(ক) "দিন দশ-পনেরোর ব্যবধানে সে দর্শনের সাহায্যে ব্যাপারতার একতা নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করলো। রাধা কি কখনো কিশোরের সান্নিধে না এসে পারে?

(খ) দ্যাখো তো ওদের? অন্য অনেক তেড়া মানুষের কথা মনে হয় না? কিন্তু তার দর্শন ব্যর্থ হলো। সে নিজেকে ধিক্কার দিল-ছি, ছি, নিজের ছেলের সম্বন্ধে একী ভাবনা। সম্বন্ধে পদ্ম মাতৃস্থানীয়া।"

ছিদাম আর পদ্ম—যাদের সম্পর্ক নিয়ে তার বাবা তথা গোসাঁই কেষ্টদাস এমন মর্মান্তিক পীড়াগ্রস্ত—তারা কি ভাবছে? লেখক ইঙ্গিতের মধ্যেই এ কাহিনীর ব্যপ্তি ও পরিণতি এঁকেছেন।

"এক রাত্রিতে চারিদিকে যখন জ্যোৎস্নার অগাধ নির্জনতা তখন ছিদাম পদ্মার পাশে বসে মাথালতা মেরামত করছিলো। সে বললো তোমাকে পদ্মই কবো।"

'কও'

দ্যাখো, পদ্ম, মানুষ যে বিয়ে করে কেন্ তা বুঝি না। কিন্তুক আমার যদি কোন কালে বউ আন দেখে শুনে আনবা।

যদি সে তোমার মত কথা কবের না জানে, যদি আমাক দিয়ে এমন করে খাতায়ে না নেয় তবে কৈল আমি তমি তমা নিয়ে খাতেবর পারি নে।" (পৃষ্ঠা ৩২০)

—বোঝা যাচ্ছে কেষ্টদাস হঠাৎ ছিদাম পদ্মকে ভুল করে অন্যায় সন্দেহ করেনি। কিন্তু কেষ্টদাস কি করতে পারে? লেখক দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ মনের ছবিতি সুন্দর এঁকেছেন ক্ষ্ম অবশেষে কেষ্টদাস স্থির করলো কৃতকর্মের ফল ভোগ তাকে করতেই হবে। সহ্য করতে পারবে না সে—

মহৎ মানুষেরা যেমন পারে; প্রাণতাকেই বার করে দিতে হবে। কেবল হাঁতা আর হাঁতা, না-খাওয়া, না-স্নান। নবদ্বীপ থেকে হেঁতে বৃণ্ডাবন সেই ধুলোর পথে হাঁততে হাঁততেও যদি প্রাণ না যায় তবে বৃণ্ডাবন থেকে বুকে হেঁতে মথুরা। ঝোলা নয়, গোপী যন্ত্রে নাম নয়। রোদ হিম

ধুলোর সাহায্যে দেহতাকে ধ্বংস করতে হবে। ছি, ছি কী মন তার। দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা? কু-এ মন আচ্ছন্ন।"

তবুও শেষ পর্যন্ত কেষ্টদাস সংসারে থাকতে পারলো না। একদিন রামচন্দ্রকে তার বইখানা ফেরৎ দিয়ে চিরতরে চলে গেলো। বাবা হয়েও সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল খন্ডিত নায়কের মতই—;

'উ্ত্তারণ পুরের ঘাত' উপন্যাসেও আমরা দেখেছি নিতাই বোষ্টমীর উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে চরণ দাস গোসাঁই ও তল পর্যন্ত না খেয়ে দেহতাকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেছিল। রামচন্দ্র সবই বুঝেছিল। সে পদ্মকে নিতে বিবাহ করে ছিদামকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। পদ্মর ত্রীবন পিপাসাকে সম্মান দিতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। আবার তার হাতেই যেন অনিবার্য নিয়তি ছিদামের ভাগ্যকে অর্পণ করেছিল।

একদিন ছিদামকে ডেকে রামচন্দ্র অনেক কথার মধ্যে শুনিয়েছিল ক্ষ্ম

"ভীষ্মর বাপ বুড়া আর সে ত্রোয়ান। কন্যের মা-বাপ কন্যের বিয়ে দিতে চায় ভীষ্মের সঙ্গে। ভীষ্ম কয়; তা হয় না;

বাপ যখন তাক চায়াছে ও কন্যে তারই। অথচ মনে করো, ইচ্ছা করলি সে-ই রাত্তকন্যে পাতে পারতো।"

—এর মধ্য থেকেই ছিদাম বুঝে নিয়েছিল পদ্ম ও তার সম্পর্ক কেবল তাদের দুত্তনের মধ্যে নেই—বুঝে নিয়েছিলো তারা বাবা কেষ্টদাসের মনোকষ্ট, পদ্মকেও সে কথা না বলে পারেনি। আর তাই শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যার পথই বেছে নিল। বন্ধু মুঙলাও ছিদামকে খুঁতে পায়নি। শেষ পর্যন্ত সাত দিন পরে খুঁতে পেয়েছিল পদ্মই। পুরনো শিব মন্তির সংস্কার করা হয়ে উঠল না আর রামচেন্দ্রর। সেই পুরানো চাতালের আমগাছতার গায়েই ছিদাম ঝুলছে উদ্বন্ধনে।

এরপর থেকে আমরা পদ্মকে পাই নিম্নোক্ত রূপে ক্ষ্ম

(ক) "অস্নাত অভুক্ত প্রায়—উন্মাদিনী পদ্ম মাতিতে মাথা কুতে কুতে শবের অনতি দূরে স্থির হয়ে বসেছিলো একসাথে; আর ছিল রামচন্দ্র। সন্ধ্যায় একতা প্রদীপ এনে কে দিয়েছিল।"

(খ) "পদ্ম আর কাঁদলো না। পুঁতিগন্ধ গলিত মৃত দেহতার পাশে লুতিয়ে পড়ে সে ফিস ফিস করে বললো, "শোন ওঠো কয়দিন ছান করো নাই, খাও নাই। চলো আমরা চলেই যাব। এখন ওঠো, খাও নাই যে। দ্যাখো না, চুলেও তেল তল পড়ে নাই।"

অবশেষে মোহিতলাল মতুমদার নিতাই কবিয়াল সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা স্মরণ করব, কেননা বর্তমান আলোচনার উপসংহার হিসাবে তা অনবদ্য ক্ষ্ম

"..............ইহা শাস্ত্র নির্দিষ্ট নয়, ইহার পথ বাঙালী আপনার অনুভূতি—অর্থাৎ নিতঅন্তরের ক্ষুথা অনুযায়ী আপনি খুঁত্তিয়া লয়। ইহারই নাম 'সহত্তিয়া'—বাঙালীই এই মন্ত্রের আদি সাধক। বাঙালী আসলে শাক্তও নয়, বৈষত্তবও নয়, বৌ্ত্তও নয়, বেদান্তীও নয়, সে সকলই কতক গুলো বাহিরের ছাঁচ মাত্র; সে ছাঁচ সে যেমন গড়ে তেমন ভাঙে, তাহার ভিতরকার সেই তরল বস্তুতা চির দিন তরলই থাকে।"

গ্রন্থঋণ

১. সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, অক্টোবর ২০০০ পৃষ্ঠা-৮২১

২. বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্বিতীয় ভাগ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২১৭৩

৩. চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ক্ষ্ম চন্ডীদাসের ধর্মদর্শন, পৃষ্ঠা-৩৫

৪.ক) গভীর নির্তন পথে ক্ষ্ম সুধীর চক্রবর্ত্তী আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯। পৃষ্ঠা-২৩৫

৪.খ) গভীর নির্তন পথে ক্ষ্ম সুধীর চক্রবর্ত্তী আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯। পৃষ্ঠা-২৩৫

৪.গ) গভীর নির্তন পথে ক্ষ্ম সুধীর চক্রবর্ত্তী আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯। পৃষ্ঠা-২৩৫

৫. শ্রী রাধার ক্রমবিকাশ-সাহিত্যে ও দর্শনে, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায় ভূদেব চৌধুরী।

৭. নীহার রঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব।

৮. সাপ্তাহিক বর্তমান ক্ষ্ম ২৩শে তুন ২০১২, ত্তান্নাথ দেবের বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা, সুদেষত্ত ধর, পৃষ্ঠা-১৬

৯.ক) সাপ্তাহিক বর্তমান ক্ষ্ম ২৩শে তুন ২০১২, ত্তান্নাথ দেবের বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা, সুদেষত্ত ধর, পৃষ্ঠা-১৩

৯.খ) সাপ্তাহিক বর্তমান ক্ষ্ম ২৩শে তুন ২০১২, ত্তান্নাথ দেবের বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা, সুদেষত্ত ধর, পৃষ্ঠা-১৪

৯.গ) সাপ্তাহিক বর্তমান ক্ষ্ম ২৩শে তুন ২০১২, ত্তান্নাথ দেবের বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা, সুদেষত্ত ধর, পৃষ্ঠা-১৭

৯.ঘ) সাপ্তাহিক বর্তমান ক্ষ্ম ২৩শে তুন ২০১২, ত্তান্নাথ দেবের বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা, সুদেষত্ত ধর, পৃষ্ঠা-১৭

৯.খ) সাপ্তাহিক বর্তমান ক্ষ্ম ২৩শে তুন ২০১২, ত্তান্নাথ দেবের বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা, সুদেষত্ত ধর, পৃষ্ঠা-৩৫

১০. সাধক ত্রীবন সমগ্র অবধূত ক্ষ্ম মিত্র ও ঘোষ, উ্ত্তারণপুরের ঘাত, ১৭ই পৌষ, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা-১২

১১. তদেব-১২পৃষ্ঠা (ক)

১২. তপস্বী ও তরঙ্গিনী, বু্ত্তদেব বসু, আনন্দ পাবলিশার্স

১৩. অচিন্ত্য বিশ্বাস ক্ষ্ম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি; রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৯৫